ATHENA, VOLUME VII,  JULY 2023 C.E. (ISSN: 2454-1605) pp. 160–168
*www.athenajournalcbm.in*

# লালন, দুদ্দু, পাঞ্জু ও কাঙাল হরিনাথের বাউল গানে স্বদেশ-চেতনা

চুমকি ঘোষ*

প্রাপ্ত: ২৭/০২/২০২৩ পরিমার্জন: ২৬/০৩/২০২৩ গৃহীত: ০৪/০৬/২০২৩

***সারসংক্ষেপ:*** *বাংলার পরিচয় চিহ্ন বা identity mark হিসাবে যেসব বিষয়কে গণ্য করা হয় বাউল তথা বাউল গান তার মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ। বাংলার বিভিন্ন লোকসংস্কৃতির মধ্যে বাউল অন্যতম। এখন প্রশ্ন হল ভারতে স্বদেশীকতাবোধ নির্মাণে বা পরাধীনতার শৃঙ্খল মোচনে বাউল তথা বাউল গানের কোনো অবদান আছে কি না? বাউল গানগুলি বিশ্লেষণে আমাদের সম্মুখে এক স্বদেশ-বান্ধবের চিন্তা-চেতনা ভেসে ওঠে, কারণ বাউল গান বরাবরই স্বদেশ ভাবনায় উজ্জীবিত। বাউলের এই স্বদেশ-চেতনা ঊনবিংশ শতাব্দীর বহু ব্যক্তিত্বের জীবন দর্শন হয়ে ওঠে, কাঙাল হরিনাথ এদের মধ্যে অন্যতম। হরিনাথ ছিলেন বাউল শ্রেষ্ঠ লালন শাহের বন্ধু, তাই তার উপর লালনের প্রভাব প্রবল। কাঙালের ‘ফিকিরচাঁদের বাউল দল’ গঠন এবং গানের মাধ্যমে গ্রামে গ্রামে সচেতনতার বার্তা প্রেরণের মূল অনুপ্রেরণাই ছিলেন লালন। স্বদেশ-ভূমির স্তুতি লালনের পদগুলিতে খুব বেশী দৃশ্য-গোচর হয় না; কিন্তু তার শিষ্য দুদ্দু শাহ বা পরোক্ষভাবে প্রভাবিত পাঞ্জু শাহের পদে স্বদেশ-ভূমির বন্দনা, স্বদেশ-স্বজাতির প্রতি প্রেম, বিদেশী শাসন ইত্যাদি প্রভূত পরিমাণে লক্ষণীয়।আলোচ্য প্রবন্ধে লালন, দুদ্দু, পাঞ্জু থেকে কাঙাল হরিনাথের পদগুলিতে স্বদেশী-বোধ কতটা স্থান-কুলান করেছে তা খোঁজার সামান্য প্রয়াস করা হয়েছে।*

***সূচক শব্দ:*** *লালন, দুদ্দু, পাঞ্জু, কাঙাল, বাউল-গান, স্বদেশপ্রেম, পরাধীনতা, জাতীয়তাবাদ।*

---

* সহকারী অধ্যাপক, নহাটা যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল স্মৃতি মহাবিদ্যালয়।
e-mail: chumkii.ghosh@gmail.com

সুদূর প্রাচীনকাল থেকে নদীমাতৃক বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন লোকসংস্কৃতি জাগরূক ছিল, বাউল তার মধ্যে অন্যতম। ইতিহাসের এক যুগ-সন্ধিক্ষণে একদল 'লোক' (নিম্নবর্ণের মানুষ) জীবন অভিজ্ঞতা থেকে 'মানুষ হয়ে ওঠার' শিক্ষা নিয়েছিল। জীবন পর্যটনে তারা কর্মবাদকে গুরুত্ব দিয়ে প্রেমের পথে, দেহকে অবলম্বন করে মানব মুক্তির পথ খুঁজেছিল – সে পথ ছিল মানুষে-মানুষে সমন্বয়ে এবং ধর্মে-ধর্মে সমন্বয়ের; বাউলের উদ্ভব এই প্রেক্ষাপট সঞ্জাত। বাউল বাংলার পরিচয় চিহ্ন বা *identity mark*। এখন প্রশ্ন হল প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ভারতের পরাধীনতার শৃঙ্খল মোচনে বাউলের কোনো অবদান আছে কী না ? বাউল গানগুলি বিশ্লেষণ করলে আমাদের সম্মুখে এক স্বদেশ বান্ধবের চিন্তা-চেতনা ভেসে ওঠে, কারণ বাউল গান বরাবরই স্বদেশ ভাবনায় উজ্জীবিত। বাউলের এই স্বদেশ চেতনা উনবিংশ শতাব্দীর বহু ব্যক্তিত্বের জীবনদর্শন হয়ে ওঠে, কাঙাল হরিনাথ যাদের মধ্যে অন্যতম। হরিনাথ ছিলেন লালনের প্রত্যক্ষ বান্ধব, সুতরাং বাউল শ্রেষ্ঠ লালনের বাউল গান বা বাউল দর্শন হরিনাথকে বিপুলভাবে প্রভাবিত করেছিল একথা বলা যায়। কাঙাল হরিনাথের স্বদেশ ভাবনায় বাউলের প্রভাব আলোচনার পূর্বে লালন শাহ, শিষ্য দুদ্দু শাহ বা পাঞ্জু শাহের মানসে স্বদেশ প্রেম তথা ব্রিটিশ শাসন কিরূপে প্রতিভাত হত তা আলোচনার দাবী রাখে।

বাউল দর্শন তথা বাউল গান জনপ্রিয়তা লাভ করে লালন ফকিরের হাত ধরে। লালন ফকিরের সময়কাল (আনুমানিক ১৭৭৫-১৮৯০ খ্রিস্টাব্দ) প্রায় ১১৫ বছর। এই সময়কালে ভারতের ব্রিটিশ শাসন প্রবিষ্ট হয় ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দে পলাশীর যুদ্ধে বাংলার নবাবের পরাজয়ের মাধ্যমে এবং ১৮৯০ সালের মধ্যে ব্রিটিশরা প্রায় সমগ্র ভারত দখল করে একটি সাম্রাজ্যবাদী শাসন কাঠামো তৈরি করে ফেলেছিল। ব্রিটিশ শাসন ও শোষণের বিরুদ্ধে সর্বপ্রথম আওয়াজ তুলেছিল ভারতের কৃষক শ্রেণীই। আলোচ্য সময়কালে বাংলায় একাধিক কৃষক বিদ্রোহ সংঘটিত হয়েছিল। লালন ছিলেন এই কৃষক সমাজেরই প্রতিনিধি; তবে ইংরেজ শাসন এবং তৎজাত কৃষক বিদ্রোহ তার মানসিকতাকে কতটা প্রভাবিত করেছিল সে সম্পর্কে বিশেষ তথ্য উপলব্ধ নয়; কিন্তু তার সাহসী ভূমিকার পরিচয় পাওয়া যায় জমিদারের রোষ থেকে বন্ধু কাঙাল হরিনাথ কে বাঁচানোর ঘটনায়। কাঙাল হরিনাথ তার পত্রিকা গ্রামবার্ত্তা প্রকাশিকা তে ধারাবাহিকভাবে শিলাইদহের ঠাকুর জমিদারের প্রজা-পীড়নের সংবাদ প্রকাশ করলে রুষ্ট জমিদার তাকে শায়েস্তা করতে লাঠিয়াল বাহিনী পাঠায় এবং লালন তার নিজস্ব লাঠিয়াল বাহিনী প্রেরণের মাধ্যমে এই আক্রমণ প্রতিহত করে বন্ধুর প্রাণ বাঁচান।[১] এর থেকে বোঝা যায় লালন জমিদারী-নিপীড়ন, তৎসঞ্জাত প্রজা-অসন্তোষ এবং নিজস্ব লাঠিয়াল বাহিনী গঠনের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে যথেষ্ট সচেতন ছিলেন। বাউল গানগুলিতে স্বদেশ অনুরাগের ছবি সর্বদা পরিস্ফুট। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মন্তব্য করেছেন, বাউল গানগুলি স্বদেশ-ভূমির এক ঐতিহাসিক পরিচয় বহন করে।[২] স্বদেশ-ভূমির মহিমাকীর্তন এবং প্রকৃতিকে 'মা' সম্বোধন বাউল গানে বিশেষ মাত্রা পেয়েছে। আসলে বঙ্গ-প্রকৃতির রূপকের আড়ালে বাউল তার বিভিন্ন তত্ত্ব ব্যক্ত করার সাথে সাথে স্বদেশ-স্বজাতির এক বিশেষ পরিচিতি জনমানসে উত্থাপন করে। যেমন—লালন ফকিরের কিছু পদের কথা বলা যায়—

"আছে, মায়ের ওতে জগৎপিতা ভেবে দেখো না।
হেলা করোনা, বেলা মেরো না।"[৩]

অথবা

"কে বা সে মায়েরে চেনে
যাহারে ভার দীন দুনিয়ার দিলেন রাব্বানা।"[৪]

কিংবা

"মায়েরে ভজিলে হয় সে বাপের ঠিকানা
নিগুম বিচারে সত্য গেল তাই জানা।।...
অঙ্গে ছিল প্রকৃতি তার
প্রকৃতি প্রকৃতি সংসার
সৃষ্টি সব জনা।"[৫]

আলোচ্য পদগুলি পুরুষ-প্রকৃতি বিষয়ক দেহতত্ত্বমূলক হলেও রূপক হিসেবে 'প্রকৃতি' এবং 'মা' সম্ভাষণ আসলে জনমানসে তা তার দেশ এবং জগৎমাতা হিসাবেই উত্থাপিত ও গৃহীত হয়। রূপকের আড়ালে বঙ্গ-প্রকৃতির নিটোল বর্ণনা সাধারণ মানুষের সামনে তার স্বদেশ-স্বজাতির একটি আকার তৈরি করে দিচ্ছিল। দেহতত্ত্ব, সৃষ্টিতত্ত্ব, প্রেমতত্ত্ব ইত্যাদি গুরু-শিষ্য পরম্পরায় প্রচারে বাউল রূপকের আশ্রয়ে যেসব শব্দ বন্ধ তার স্বদেশ-সমাজ থেকে চয়ন করেছিল তা পরবর্তীকালে বুদ্ধিজীবী মানসিকতায় জারিত হয়ে বিশেষ অর্থবহ হয়ে ওঠে।

মুহম্মদ মনসুরউদ্দীনের হাত ধরে লালন রচিত পদগুলির অনেকটাই সংগৃহীত হলেও বোধহয় সবটা সম্ভব হয়নি। আর সেই তথ্যের অপ্রতুলতার কারণেই হোক অথবা লালন বিষয়ে অনেক ধোঁয়াশা থাকায় হোক তার পদগুলিতে প্রত্যক্ষ স্বদেশ-চিন্তা অনুপস্থিত। কিন্তু লালনের প্রত্যক্ষ শিষ্য দুদ্দু শাহের (১৮৪১-১৯১১ সাল) পদগুলিতে স্বদেশ-চিন্তা ও জাতীয়তাবোধ তীব্র আকার ধারণ করেছে।বাউল গান ও দুদ্দু শাহ গ্রন্থে দেখা যায় বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর দুদ্দুর পদগুলিকে যে বিভিন্ন ভাগে ভাগ করেছেন তার মধ্যে সমাজ চেতনা, জাতিভেদ ইত্যাদি ভাগ রেখেছেন এবং সেই পদগুলি বিশ্লেষণ করলে বোঝা যায় কি গভীর দেশপ্রেমিক ছিলেন সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির পূজারি এই চারণ কবি। দুদ্দুর মানবতা, সমাজ-সচেতনতাই এই দেশপ্রেম। শক্তিনাথ ঝা দেখিয়েছেন যে,"তিনি শুধু দেশকে নয়, দেশের হৃদয় যে ভাষায় কথা কয়, ধর্ম সম্প্রদায়ের গণ্ডি পেরিয়ে তাকে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন।"[৬] রবীন্দ্রনাথের 'মহামানবের সাগরতীর' অথবা বিবেকানন্দের 'দরিদ্র ভারতবাসী', 'শূদ্র ভারতবাসী'র ধারণার পরিস্ফুটন ঘটেছে দুদ্দুর এই পদটিতে—

"এ দেশের মুসলমানে বড়াই করে
আমরা বাদশাহ জাতির খান্দান রে।।
সহস্র বৎসের পূর্বে ভাই
মুসলমানের গন্ধ দেখি নাই
যত অনার্য শূদ্র ওরাই, ধর্ম ভারত হয় রে...।"[৭]

প্রবল দেশপ্রেমিক এই মানুষটি উপলব্ধি করেছেন, হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে অন্তর্কলহের সুযোগেই ভারতে খ্রিস্টান ধর্ম ও সাম্রাজ্যবাদী শক্তির অনুপ্রবেশ ঘটেছে। তাই তিনি বলেছেন—

"... জাতি আর সম্প্রদায় মিলে
ভারত শ্মশান করিলে...।"[৮]

অন্য একটি পদে তিনি বলেছেন কোটি কোটি ভারতবাসীর মধ্যে ঐক্যবদ্ধতা না থাকায় ফিরিঙ্গিরা এদেশের শাসক হল এবং খ্রিস্টধর্ম প্রচারের সুযোগ ঘটলো।[৯] পরাধীনতার তীব্র গ্লানি ও বিষ দুদ্দুর রচনায় বিশেষ প্রাধান্য পায়। জাগতিক ভোগ-সুখবাদ এবং সমাজ নির্মিত জাতি প্রথাকে খারিজ করে দুদ্দু যে সাম্যমূলক সমাজ গঠনের আহ্বান করেছেন সেখানে দুদ্দু অবশ্যই একজন সমাজ সংস্কারপন্থী, স্বাধীনতাকাঙ্খী, স্বদেশী নায়ক।

ইংরেজ শাসন ও শোষণ, পরাধীনতা, খ্রিস্টান ধর্ম ইত্যাদি বিষয়ে পদ রচনা করেছেন লালন ঘরনার অন্যতম শিষ্য পাঞ্জু শাহ (১৮৫১-১৯১৪ সাল), যদিও পাঞ্জু লালনের প্রত্যক্ষ শিষ্য ছিলেন না। সুফি মতাবলম্বী হলেও তার উপর লালনের বিপুল প্রভাব ছিল। মহাবিদ্রোহের অব্যবহিত কাল থেকেই পাঞ্জুর যাত্রা শুরু। তাই সাম্প্রদায়িক ভেদাভেদ, ধর্মীয় বৈষম্য জনিত প্রতিহিংসা এবং রাজনৈতিক স্বার্থসিদ্ধির জন্য সংগ্রাম তার কাছে একটি কেন্দ্রীয় সমস্যা হিসাবেই প্রতিভাত হয়েছে এবং তা থেকে মুক্তির পথ হিসাবে তিনি 'আত্মজয়ের' পথকেই বাছার কথা বলেছেন।[১০] পাঞ্জুর রচনাতেও জাতিভেদের কুফল, ইংরেজ শাসনের অসারতার কথা বিভিন্ন সময় তুলে ধরা হয়েছে। ইংরেজি শিক্ষা ও সংস্কৃতি, খ্রিস্টান ধর্মের প্রভাব এদেশের সমাজ-মানসকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল, এই ব্যবস্থাকে 'মহাফ্যাসাদ' বলে বর্ণনা করে তিনি দুঃখ প্রকাশ করেছেন—

"পাদরি ফ্যাসাদ করে সকলের কাছে
যিশুখ্রিষ্ট ভালো জানো আর সব মিছে...।"[১১]

১২৯৭ বঙ্গাব্দে বাংলাদেশের ভয়াবহ বন্যা এবং তার সর্বগ্রাসী ছোবল স্বদেশবাসীকে কিভাবে তিল তিল করে মৃত্যুর পথে ঠেলে দিচ্ছিল তা এই স্বদেশ বান্ধব মানুষটিকে তীব্রভাবে ক্ষত-বিক্ষত করেছিল, যা তার বিভিন্ন পদে ব্যক্ত হয়েছে—

“জলের খেলা, দেখে ঠেলা, কম্প হল মহাপ্রাণ,
সাতানব্বই সালের বন্যায় থাকলো না আর কুল-মান।”[১২]

একমুঠো ভাতের জন্য হাহাকারও ফুটে ওঠে তার পদে।[১৩] এছাড়াও প্রথম বিশ্বযুদ্ধ এবং তার ভয়াবহ ধ্বংসলীলা মানব সভ্যতাকে যে শেষ করে দিতে চাইছে তার বেদনা তার মরমী হৃদয়কে ব্যথাতুর করেছিল, যার উল্লেখ তিনি তার পদে করে গেছেন—

“কামান-বন্দুক বোমাবাজি
মানুষকে পশু বানায় আজি,
সৎকাজে মন হয় না রাজি
ভাইয়ের রক্ত ভাই নিয়েছে।”[১৪]

পাঞ্জু শাহের এই আর্তনাদ আমাদের সম্মুখে এক স্বদেশ-বান্ধবের প্রতিকল্পই নির্মাণ করে, যে যুক্তি দিয়ে, সমন্বয়ের মাধ্যমে এমন এক মানব সমাজ গঠনের আহ্বান জানিয়ে গেছেন যা বৈষম্যপীড়িত নয়।

বাউলের স্বদেশ ভাবনা ঊনবিংশ শতাব্দীতে যেসব বিশিষ্ট জনের মানসিকতাকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল কাঙাল হরিনাথ (১৮৩৩-১৮৯৬ সাল) তাদের মধ্যে অন্যতম। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম পর্যায়ে গ্রাম বাংলার চিত্র অঙ্কন করলে দেখা যায় যে, ইংরেজ শাসন ও শোষণ বিষয়ে সাধারণ মানুষ প্রায় অজ্ঞ ছিল। অশোক চট্টোপাধ্যায় তাঁর কাঙাল হরিনাথ প্রবন্ধে দেখিয়েছেন যে, নিত্য নৈমিত্তিক জীবন চর্যার অবসরে ছিল রামায়ণ ও মহাভারত -এর মধুর গাঁথা শোনা কিংবা কথক ঠাকুরের কথকতায় মনোনিবেশ করা এবং উৎসবকালে কীর্তন, যাত্রা, পাঁচালী, ঢপ, কবি ও তরজা ইত্যাদির ধূমে মগ্ন হওয়া।[১৫] তার সাথে ছিল বাউল গানের জনপ্রিয়তা। বিভিন্ন সমালোচনা ও প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও বাউল গান কেবলমাত্র গ্রাম বাংলার চৌহদ্দির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকেনি, এর প্রভাব কতিপয় শহুরে বাঙালি বুদ্ধিজীবীদের চিন্তা ও চেতনার জগৎকে আলোড়িত করেছিল।[১৬] উপস্থাপনে, আবেদনে, ও জনমত গঠনে বাউল গান ছিল অনন্য। সর্বোপরি বাউল দর্শন কারো কারো জীবন দর্শন হয়ে ওঠে। এভাবেই বাউল গান কুমারখালির কাঙাল হরিনাথের জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দেয়। জলধর সেন দেখিয়েছেন যে, কাঙাল হরিনাথ পূর্ববঙ্গের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার কাছে বাউল গান দ্বারাই পরিচিতি লাভ করেছিলেন কারণ, বাউল গানের সহজ, সরল, প্রাণ স্পর্শী কথায় শিক্ষিত-অশিক্ষিত নির্বিশেষে সব শ্রেণীর মানুষই মুগ্ধ ছিল এবং অল্পদিনের মধ্যেই বাউল গানের উদাসী সুর মাঠে-ঘাটে সর্বত্র শোনা যেত। [১৭] প্রথাগত শিক্ষায় শিক্ষিত না হয়েও এবং ইংরেজিতে অজ্ঞ থাকা সত্ত্বেও হরিনাথ নিজ চেষ্টায় বাংলা ও সংস্কৃত শেখেন। শিক্ষকতার মাধ্যমে জীবন শুরু হলেও তৎকালীন বিভিন্ন সমস্যা জনসমাজে তুলে ধরা, অন্ধকারাচ্ছন্ন মানুষের চোখে শিক্ষার আলো পৌঁছে দেওয়া ইত্যাদি ছিল হরিনাথের জীবন ব্রত।[১৮] এই ব্রতই তাকে প্রাণিত করে ১৮৬৩ সালের এপ্রিলে গ্রামবার্ত্তা প্রকাশিকা সংবাদপত্র প্রকাশ করতে। এই পত্রিকায় তিনি নিয়মিতভাবে জমিদারী পীড়ন, প্রজা বিদ্রোহ, ইংরেজদের জাতি বিদ্বেষ, সম্পদের বহির্গমন, অবশিল্পায়ন ইত্যাদি বিষয়ে প্রতিবেদন লিখতে শুরু করলে তা তৎকালীন শাসক তথা জমিদারী শ্রেণীর মাথা ব্যথার কারণ হয়ে ওঠে।[১৯] রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত তাঁর কাঙাল হরিনাথ প্রবন্ধে দেখিয়েছেন যে, আসলে কাঙাল বরাবরই লোক-শিক্ষার কাজটি গ্রাম বাংলার সরল অক্ষর জ্ঞানহীন মানুষ তথা সমগ্র জনসমাজে সুচারুভাবে করে যেতে চেয়েছিলেন; আর এরকম এক প্রেক্ষাপটে বাউল গান হয়ে ওঠে স্বদেশভূমির কল্যাণকর কাজের মুখ্য অস্ত্র। ১৮৮০ সালে কাঙাল ‘ফিকিরচাঁদের বাউল দল’ প্রতিষ্ঠা করেন এবং অল্পদিনের মধ্যেই ফিকিরচাঁদের গান নিম্ন শ্রেণী হতে উচ্চ শ্রেণীর লোকের কাছে আনন্দকর হয়ে ওঠে।[২০] রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত আরও দেখিয়েছেন যে, হরিনাথ একদিকে যেমন গ্রামের জমিদারদের সঙ্গে লড়েছেন, অন্যদিকে সরকার পক্ষের সঙ্গে তর্ক চালানোর সাথে সাথে গান রচনা করে গ্রামবাসীকে

শোনাচ্ছেন, অথচ এই দুই কর্মের মূল উৎস এক খাঁটি সমাজসেবী, ভক্ত ও বৈরাগীর।[২১] তিনি আরও বলেছেন,“ঈশ্বর মুখিনতায় জাগতিক লাভও বড় কম নয়। স্ট্র্যাটেজি হিসাবে ইহার একটু উপযোগিতা থাকলেও থাকিতে পারে। যে রাষ্ট্রের কর্তা ব্যক্তিরা অন্তরে অর্কতা এবং ঈশ্বর ভক্তিতে উদ্বুদ্ধ সে রাষ্ট্রে ‘cult of the individual’-এর বড় বিপদ থাকে না।”[২২] অন্যদিকে ড. সত্যবতী গিরি তাঁর কাঙাল হরিনাথ : সমাজ ও সাহিত্য ভাবনা প্রবন্ধে দেখিয়েছেন যে, দেশীয় সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে নিজের সৃষ্টিতে কাঙাল তুলে ধরে দেশের অগণ্য সাধারণ নিরক্ষর মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে প্রকৃতই তিনি লোক-শিক্ষকের ভূমিকা নিয়েছিলেন।[২৩] রাধাচরণ রায় তাঁর বাউল কবি কাঙাল হরিনাথ প্রবন্ধে দেখিয়েছেন যে, কাঙাল ধর্ম ও কর্মের এক অপূর্ব সমন্বয় ঘটান এবং যৌবনে স্বদেশ সেবার মহান ব্রতটি পরবর্তীকালে তার জীবনকে মহনীয় ও গৌরবান্বিত করেছিল।[২৪]

প্রকৃতপক্ষে কাঙাল হরিনাথের বাউল গান করার অনুপ্রেরণা এসেছিল বন্ধু লালন ফকিরের নিকট হতেই। জলধর সেন লালন সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন, তিনি বক্তৃতাও করতেন না, ধর্মকথাও বলতেন না, তার এক অমোঘ অস্ত্র ছিল, তা বাউল গান, যা দিয়ে তিনি সকলকে মুগ্ধ করতেন।[২৫] যেহেতু স্বদেশ সেবার মহান ব্রতে কাঙাল ছিলেন উৎসর্গীকৃত তাই লালনের মত কাঙালের গানও আত্মতত্ত্ব, দেহতত্ত্ব, সমন্বয়বাদ,বিশ্ব মানবতাবাদ, মনের মানুষকে খুঁজে ফেরার আকুল মিনতি ইত্যাদির সাথে সাথে যুক্ত হয়েছে স্বদেশের মহিমা কীর্তন, সামাজিক মান উন্নয়ন এবং ইংরেজ শাসনাধীন ভারতের এক সুস্পষ্ট প্রতিচ্ছবি যা লালনের গানে অনুপস্থিত। উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য অবশ্য ফিকিরচাঁদের বাউল গানকে প্রকৃত বাউল গান বলতে নারাজ, কারণ কাঙাল বাউল গানের ছন্দ ও সুরে সাধারণ ভগবত-প্রেম, ভক্তি, পরমাত্মা ও জীবাত্মার স্বরূপ, দেহতত্ত্ব ইত্যাদির সাথে সাথে সামাজিক প্রসঙ্গ (লালনের পদেও উপস্থিত), ভারত নারীর বৈশিষ্ট্য, ভিক্টোরিয়ার দয়া, দেশের সমসাময়িক অবস্থা, ইংরেজ সভ্যতায় দেশের মতিগতি নিয়ে গান রচনা করেছেন, তাই ভট্টাচার্যের মতে কাঙাল প্রকৃত বাউল নয়, ‘শখের বাউল’, যার আবির্ভাব ঊনবিংশ শতাব্দীতে।[২৬] সমালোচনা সত্ত্বেও বলা যায় যে বাউল গানের মাধ্যমেই কাঙাল প্রকৃতপক্ষে স্বদেশবোধের সঞ্চার ঘটাতে সক্ষম হয়েছিলেন। ইংরেজ শাসনের ফলে গৌরবময় ভারতে দুরবস্থার ছবি পরিস্ফুট হয় কাঙাল রচিত এই পদটিতে—

“তুমি কি সেই ভারতবর্ষ তাই বল।
তোমার ধন ঐশ্বর্যে, বল বীর্যে পৃথিবী কেঁপেছিল। (একদিন)
তুমি বৃক্ষের তলায়, বসে কি ভাবিছ হায়,
কেন শূন্য মাথার, তোমার, মুকুট কেড়ে কে নিলো;
তোমার বসন ভূষণ করে হরণ, সন্ন্যাসী কে সাজালো। (হায়রে) …।”[২৭]

কাঙালের বাউল গানগুলিতে একদিকে যেমন সনাতন ভারতের প্রাচীন গৌরব গাঁথার বর্ণনা আছে, তেমনি পরবর্তীকালে ভারতের দরিদ্র স্তরে অবতরণের বেদনাও স্পষ্টভাবে উদ্ভাসিত। কাঙাল তার অন্য একটি পদে বলেছেন -

“এই কি সেই আর্য সন্তান
ও যার তপোবলে যোগবলে কাপিত দেবতার প্রাণ, সদা।…
যার শিল্প আর বিজ্ঞান যোগতত্ত্ব আত্মজ্ঞান,
করেছিল পৃথিবীর একদিন চক্ষুদান;…।”[২৮]

উল্লেখ্য এই যে, কাঙালের গানে স্বদেশ বন্দনা যতটা মাহাত্ম্য পেয়েছে, জমিদারী শাসনে প্রজা-নিপীড়নের ছবি, দেশবাসীর মধ্যে সৌভ্রাতৃত্বের অভাব, ধর্মবোধের অভাব, যতটা স্থান পেয়েছে অনুরূপভাবে ব্রিটিশ বিরোধী মানসিকতা যেখানে অনুপস্থিত, বরং ব্রিটিশ স্তাবকতাই সেখানে প্রধান হয়ে উঠেছে। আসলে কাঙালের স্বদেশীয়ানা ব্রিটিশ বিরোধিতায় নয় বরং ব্রিটিশদের মতো উদারপন্থী, মানবতাবাদী, পাশ্চাত্য শাসনের অভিভাবকত্বে অন্তর্দ্বন্দ্বেদীর্ণ দরিদ্র ভারতবাসীর পার্থিব উন্নতি সম্ভব, স্বদেশের সমৃদ্ধি সম্ভব বলে তিনি মনে করতেন। তাই ফিকির চাঁদের বাউল গানে রানী ভিক্টোরিয়া,

বড়লাট রিপনের ভূয়সী প্রশংসা লক্ষ্যণীয়। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় ব্রিটিশ পার্লামেন্টের সদস্য ফসেটের মৃত্যুতে শোকতপ্ত কাঙাল ফসেটকে ভারতবন্ধু, কৃষকের বন্ধু রূপে বর্ণনা করে একটি পদ রচনা করেছেন -

"হায়রে আজ একি শুনি শ্রবণে;
সেই যে দয়ার সিন্ধু ভারতবন্ধু, ফসেট আর নাই ভুবনে।
কে আর ভারতের হিতে, পার্লিয়ামেন্ট সভাতে, কাঁপাইবে, কাঁদাইবে, বাক্য অশ্রুতে;
থেকে সিন্ধু পারে ভারতেরে দেখবে স্নেহনয়নে, কে আর,
হয়ে কৃষকের তণয়, র‍্যাঙ্গালার ফেলো পরীক্ষায়;
পার্লামেন্টের হেকনীর মেম্বার পদটি শেষে পায়।
...।"[২৯]

কাঙাল তার অন্য একটি পদে ফসেটকে ভারতের বন্ধু সুজন, সুহৃদ এবং অনাথ ভারতকে ভ্রাতৃস্নেহ প্রীতিতে আবদ্ধ করেছেন বলে অভিহিত করেছেন। তাই ফসেটের ন্যায় সুহৃদের ৫১ বছর বয়সে নিউমোনিয়ার আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুতে তিনি প্রকৃত হিতৈষির বিয়োগ বেদনায় ব্যথিত হয়েছেন।৩০ অন্য একটি পদে কাঙাল মহারানী ভিক্টোরিয়াকে অনাথ ভারতের মাতা, মুক্তির ত্রাতা রূপে মহিমান্বিত করেছেন এবং ব্রিটিশ শাসনের জয়ধ্বজা তুলে ধরেছেন -

"ব্রিটিশের নিশান তুলি সবে মিলি, করো জয় মঙ্গল ধ্বনি
বলরে অনাথ মাতা পতিব্রতা, ভিক্টোরিয়া মহারানী;
...
তিনি যে রোগীর পাশে অনাথ বাসে দীনজনের জননী।"[৩১]

আবার বড়লাট রিপনের রাজত্বকালকে 'রামরাজত্ব' বলে চিহ্নিত করে তার বিদায় কালে রাজভক্তিতে জারিত হরিনাথ বিশেষ স্তুতি রচনা করেছেন তার ফিকির চাঁদের পদে -

"দেশে চলিলেন মহামতি রিপন, রামরাজ্যসম প্রজা করিয়ে পালন।
সুশাসনে এ ভারতে, ছিল প্রজা নিরাপদে;
তোমার বিরহে কাঁদে নরনারীগণ।।
...।
ভিক্টোরিয়া মাতা যখন জিজ্ঞাসিবে বলো তখন;
সোনার খনি নাই আর এখন ভারত ভবন।
দুর্ভিক্ষ প্রতি বছরে; অন্ন বিনা প্রাণে মরে;
ম্যালেরিয়া মহাজ্বরে নাশে প্রজাগণ,
...।"[৩২]

কাঙালের কাছে রিপনের বিদায়কাল দুঃখের এবং সেইসাথে একজন ভারত হিতৈষী শাসকের প্রস্থানে তিনি ব্যথিত। ভারতমাতা ভিক্টোরিয়ার কাছে ভারতের দুরবস্থার কথা প্রেরণ করার একমাত্র মাধ্যমও বটে রিপন, তাই স্বদেশের ব্যথায় ব্যথিত কাঙালের এই করুণ আবেদন।

স্বদেশপ্রেম ও দৈনন্দিন জীবনের সংগ্রামের সাথে কাঙাল বাউল গানকে যুক্ত করেছিলেন। প্রচলিত ব্যবস্থার মৌলিক পরিবর্তন সাধন নয় বরং শাসক শ্রেণীর প্রতি আস্থা রেখেই তিনি ভারতবাসী তথা ভারতবর্ষের সুবিচার ও সমৃদ্ধি প্রার্থনা করেছেন। জমিদারী প্রথার অবসান নয় বরং অত্যাচার নিবারণের পক্ষপাতী ছিলেন; অত্যাচারী নীলকরদের শাস্তি চেয়েছিলেন, ব্রিটিশ শাসনের অবসান নয়।[৩৩] ১৮৫৬ সালের সাঁওতাল বিদ্রোহ কিংবা ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহ ইত্যাদি ব্রিটিশ বিরোধী অভ্যুত্থানে হরিনাথের প্রতিক্রিয়া 'সংযত' ও 'স্থিতধী' এবং ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহের কারণ হিসেবে ব্রিটিশ

সরকারের প্রতি ভারতবাসীর অনাস্থাকেই তিনি দায়ী করেছেন।[৩৪] কাঙাল হরিনাথ তার গ্রামাবার্ত্তার বিভিন্ন প্রতিবেদনে দেশীয় শিল্পের বিকাশ, শ্বেতাঙ্গ বিদ্বেষ, বিচার ব্যবস্থার সমতা, স্বাধীনতা ইত্যাদি অনেক বিষয়ে গণচেতনা গড়ে তুলতে সমর্থ হলেও ব্রিটিশ শাসনের অবসান নয়, উনিশ শতকীয় বুদ্ধিজীবীদের মতো তিনিও ব্রিটিশ শাসনভুক্ত থেকেই সামাজিক ও রাজনৈতিক সংস্কারের পক্ষপাতী ছিলেন।[৩৫]

আসলে স্বদেশের প্রতি অনুরাগ এবং শাসক শ্রেণীর প্রতি বিদ্বেষবোধ হয়তো কোনো প্রতিস্পর্ধী স্থানে অবস্থান করে না; সত্যবতী গিরি দেখিয়েছেন যে, আর সেই কারণেই উনিশ শতকীয় নবজাগরণের বুদ্ধিজীবীদের স্বদেশ চেতনায় ব্রিটিশ প্রতিস্পর্ধীতা দৃশ্যগোচর হয়নি। ঈশ্বর গুপ্ত, নবীনচন্দ্র, বঙ্কিমচন্দ্র প্রমুখের ন্যায় কাঙালও সেই একই মানসিকতার বীজ বহন করেছিলেন।[৩৬] রমেশচন্দ্র দত্তের জীবনীকার দেখিয়েছেন যে, "ভারতের আধুনিক শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে একটি ভুল ধারণার জন্ম হয়েছে যে বিদেশী বিদ্বেষই স্বদেশ হিতৈষনার প্রধান অভিজ্ঞান এবং রাজ প্রতিকূলতাই প্রজানুকূল্যের প্রকৃষ্ট পদ্ধতি আসলে তা ভুল।"[৩৭] অর্থাৎ ব্রিটিশভক্তি ও স্বদেশ অনুরাগ পরস্পর বিরোধিতায় অবস্থান করে না। বলাইবাহুল্য এই ধারণাই হয়তো ভারতে ব্রিটিশ শাসনকে দীর্ঘতর করেছিল, কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, তাদের মধ্যে স্বদেশ প্রেমে ঘাটতি ছিল। কাঙাল বলেছেন—

"...যদি ডাকার মত পারিতাম ডাকিতে
তবে কি মা এমন করে তুমি লুকিয়ে থাকতে পারতে...।"[৩৮]

আলোচ্য পদটিতে মাকে পাওয়ার যে ব্যাকুলতা ফুটে ওঠে তা প্রকৃতই এক স্বদেশীর। তাই একথা অস্বীকার করা যায় না যে, বাঙালির জাতীয়তাবাদের জন্মের পশ্চাতে কাঙালের কলম বা ফিকিরচাঁদের বাউল গানেরও এক বিশেষ ভূমিকা ছিল। হিন্দু-মুসলমান বিদ্বেষের কুফল থেকে শুরু করে দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থা, স্ত্রী শিক্ষার প্রচার ও প্রসারে একান্ত খাঁটি স্বদেশ বান্ধব এই মানুষটি কেবল নিজের জীবনকেই কাগজে-কলমে উৎসর্গ করে থেমে থাকেনি, বাংলার শিক্ষিত-অশিক্ষিত জনমানস নির্বিশেষে বাস্তবে তা অনুপ্রবেশ করানোর দায়িত্বটিও প্রকৃত দেশ হিতৈষির ন্যায়ই গর্বভরে পালন করে গেছেন এবং বাউল গান হয়ে উঠেছিল তার এই কাজের প্রধান বাহন।

আসলে ঊনবিংশ শতাব্দীর যে সকল ব্যক্তিত্ব বাউল এবং বাউল গান দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়েছিল তারা মানবতাবাদ, প্রগতিবাদ, যুক্তিবাদ, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য তথা স্বাধীনতা ইত্যাদি দর্শনকে এই সনাতন ভারতবর্ষে প্রায় অশিক্ষিত (তথাকথিত) লোকের দ্বারা লালিত বাউলের মতো লোকধর্মে খুঁজে পেয়েছিলেন, পাশ্চাত্যে নয়। বিপিনচন্দ্র পালের মতে, ঊনবিংশ শতাব্দীতে যারা এই বিশেষ যুক্তিবাদকে প্রাধান্য দিতে শুরু করেছিল আসলে তারা তাকে এই স্বদেশের মাটিতেই খুঁজে পেয়েছিলেন, যেখানে শাস্ত্র নেই, পুরোহিত নেই, ঈশ্বরের উপদেশ নেই, যার প্রামাণ্য মানুষের অন্তরে, সাধারণ মানব প্রকৃতির মধ্যে, মানুষের নিত্য দিনের অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানের মধ্যে এবং অবশ্যই তার স্বদেশভূমির মধ্যে।[৩৯] লালন, দুদ্দু, পাঞ্জু, রচিত পদগুলি আসলে স্বদেশভূমি থেকে গভীরভাবে উৎসারিত। তাই দেশকে জানতে, দেশীয় সংস্কৃতিকে উপলব্ধি করতে ঊনবিংশ শতাব্দীর বিদ্বজ্জনগণ বাউলের মতো লোক ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হন এবং সেখানেই তারা খাঁটি স্বদেশ ভাবনার মূল খুঁজে পেয়েছিলেন। কল্পনার পলিমাটি দিয়ে গড়ে তোলা বাউলের মুক্ত সমাজ আসলে আমাদের পরম আকাঙ্ক্ষিত স্বদেশ ভূমি। সেই কারণে বাউল গান ও বাউল চরিত্র সর্বদা স্বদেশের প্রতীক হিসেবে গৃহীত হয়েছে। আঞ্চলিক জাতীয়তাবাদের ঊর্ধ্বে উঠে বাউল প্রকৃতই স্বদেশ প্রেমের এক মহান বার্তাবাহক।

## সূত্র নির্দেশ:

১. চৌধুরী, আবুল আহসান, (১৯৯৯), *সমাজ, সমকাল ও লালন সাঁই*, কথাছাপা, পৃ. ২২।

২. শরীফ, আহমদ, (১৯৭৩), *বাউল তত্ত্ব*, বাংলা একাডেমী, পৃ. ৬১।

৩. ভট্টাচার্য, উপেন্দ্রনাথ, (১৪০৮ বঙ্গাব্দ), *বাংলার বাউল ও বাউল গান,* ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি, পৃ. ৬৫১, পদ নং ১৭৫।

৪. তালিব, আবু, (১৯৬৮), *লালন শাহ ও লালন গীতিকা, ২য় খণ্ড,* বাংলা একাডেমী, পৃ. ৭৮।

৫. পূর্বোক্ত, চৌধুরী, আবুল আহসান, (২০০৯), *লালন সমগ্র,* পাঠক সমাবেশ, পৃ. ৫৭৭।

৬. ঝা, শক্তিনাথ, (২০১২), (সম্পা.), *দুদ্দু সা'র পদাবলি,* সহজপাঠ, পৃ. ১২।

৭. জাহাঙ্গীর, বোরহানউদ্দিন খান, (১৩৭১ বঙ্গাব্দ), (সম্পা.), *বাউল গান ও দুদ্দু শাহ,* বাংলা একাডেমী, পৃ. ৫১।

৮. *তদেব,* পৃ. ৬৯।

৯. *তদেব,* পৃ. ৭৭।

১০. হক, খোন্দকার রিয়াজুল, (১৯৯০), *মরমী কবি পাঞ্জু শাহ : জীবন ও কাব্য,* বাংলা একাডেমী, পৃ. ২৩৩।

১১. *তদেব,* পৃ. ৮৫।

১২. *তদেব,* পৃ. ৯৬, ৯৭।

১৩. *তদেব,* পৃ. ৯৬, ৯৭।

১৪. *তদেব,* পৃ. ৯৮।

১৫. ঘোষাল, ধনঞ্জয়, (২০০৭), (সম্পা.), *হরিনাথ মজুমদার ও বাঙালী সমাজ,* সহযাত্রী, পৃ. ৯৬-৯৭।

১৬. ঝা, শক্তিনাথ, (১৯৯৫), *ফকির লালন সাঁই দেশ কাল এবং শিল্প,* সংবাদ, পৃ. ১৮৩।

১৭. সেন, জলধর, (২০১০), *কাঙাল হরিনাথ,* উবুদশ, পৃ. ৪৭।

১৮. চট্টোপাধ্যায়, অশোক, (২০০৭), *কাঙাল হরিনাথ মজুমদার, জীবন, সাহিত্য ও সমকাল,* উবুদশ, পৃ. ১২৩।

১৯. দত্ত, অমর, (২০০২), (সম্পা.), *গ্রামবার্ত্তা প্রকাশিকা,* প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স।

২০. চৌধুরী, আবুল আহসান, (১৯৯৮), (সম্পা.), *কাঙাল হরিনাথ মজুমদার স্মারক গ্রন্থ,* বাংলা একাডেমী, পৃ. ৮০।

২১. *তদেব,* পৃ. ৮০।

২২. *তদেব,* পৃ. ৮০।

২৩. *পূর্বোক্ত,* পৃ. ৯০।

২৪. *পূর্বোক্ত,* পৃ. ১১৫।

২৫. সেন, জলধর, (২০১০), *পূর্বোক্ত,* পৃ. ৫১।

২৬. ভট্টাচার্য, উপেন্দ্রনাথ, (১৪০৮ বঙ্গাব্দ), *পূর্বোক্ত,* পৃ. ১০৩।

২৭. পরিবেশক, প্রকাশ ভবন, (২০০৮), *কাঙাল ফিকির চাঁদের বাউল সঙ্গীত,* পৃ. ১০৩।

২৮. *তদেব,* পৃ. ৮৮।

২৯. *তদেব,* পৃ. ৯২।

৩০. *তদেব,* পৃ. ৯২-৯৩।

৩১. *তদেব,* পৃ. ৯৭।

৩২. *তদেব,* পৃ. ৯০-৯১।

৩৩. ঘোষাল, ধনঞ্জয়, (২০০৭), *পূর্বোক্ত,* পৃ. ১০৬।

৩৪. *তদেব,* পৃ. ১০৭।

৩৫. দত্ত, অমর, (২০০২), *পূর্বোক্ত*, চট্টোপাধ্যায়, অশোক, (১৯৯৫), *উনিশ শতকের সামাজিক আন্দোলন ও কাঙাল হরিনাথ*, লেখক সমাবেশ, পৃ. ১৫৬।

৩৬. চৌধুরী, আবুল আহসান, (১৯৯৮), *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৯২।

৩৭. চট্টোপাধ্যায়, অশোক, (১৯৯৫), *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৬০।

৩৮. পরিবেশক, প্রকাশ ভবন, (২০০৮), *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৬০।

৩৯. পাল, বিপিনচন্দ্র, (২০১২), *নবযুগের বাংলা*, চিরায়ত, পৃ. ৫৯, ৬৬।